গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কার নির্দেশে, কেন জয়নগরে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হল নিরপরাধ যুবককে

২২ জুলাই, কলকাতা ঃ মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই বন্দুকধারী মানুষরূপী রোবট পুলিশের কাছে। না হলে কেন্দ্রীয় সিআইএসএফ বাহিনীর পুলিশ ১৯ জুলাই রাতে ওভাবে গুলি চালিয়ে পৈশাচিক নির্মমতায় হত্যা করতে পারত না শান্ত স্বভাবের ৩২ বছরের যুবক এস ইউ সি আই (সি) কর্মী সর্বজনপ্রিয় কমরেড অমল হালদারকে। মানুষের ধিক্কার ও ঘৃণা আজ অবিরাম অশ্রুজল হয়ে ঝরে পড়ছে জয়নগরের বুকে। রাজ্যের সর্বত্রই

২১ জুলাই রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে শোকবেদি

সাধারণ মানুষের মনে গভীর ব্যথার জন্ম দিয়েছে এই ঘটনা। ২১ জুলাই সব জেলায় রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, রাস্তার মোড়ে, গ্রামের হাটে-গঞ্জে নির্মিত শোকবেদিতে নীরবে মাল্যদান করে প্রতিবাদ ও বেদনা ব্যক্ত করেছেন সাধারণ মানুষ। ভোটের লাইনে অপেক্ষমান জনতার উপর কেন এমনভাবে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানো হল, কারা ঐদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডেকে আনল, কার নির্দেশে গুলি চলল— এসব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটি। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত গরিব ঘরের সামান্য উপার্জনশীল ঐ যুবকের মৃত্যুর পর ঐ পরিবারকে রক্ষা করার দায় সরকারেরই। তাই রাজ্য কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে দাবি জানিয়েছে ২ লক্ষ টাকা ঐ পরিবারকে দেওয়া হোক, তার সাথে ঐ পরিবারের একজনকে চাকরি।

অমল হালদারের মরদেহে মাল্যদান করছেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

১৯ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট পর্ব চলছে। রাত তখন ৮টা। জয়নগর থানার মায়াহাউড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের দাড়া বাপুলিরচক বুথে তখনও ভোট চলছে, ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। বুথের মোট ১০৩৮ জন ভোটারের মধ্যে তখনও পাঁচশ'রও বেশি মানুষের ভোট বাকি। অনেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ মাঠেপলিথিন পেতে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছেন। বুথের বাইরে থাকা এক পুলিশ অফিসারকে সারাদিন অসংখ্যবার যেমন বলেছেন, তেমনই আরও একবার আবেদন করেছিলেন ভোট প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য। দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার কারণে কিছুটা অসন্তোষও ব্যক্ত করেছেন। সর্বত্রই এমন পরিস্থিতিতে ভোটাররা যেভাবে অসন্তোষ জানান, ওখানেও তার বেশি কিছু নয়। এই অর্থে উত্তেজনা ছিল না, প্ররোচনা তো ছিলই না। এই সময়ই হঠাৎ কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্রাম্যমান ফোর্স সেখানে হাজির হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ রে রে করে গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষমান ভোটারদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে দেয়। মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ ইনসাস রাইফেল থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। ভয়ার্ত মানুষ ছুটতে থাকে এদিক ওদিক। ইতিমধ্যে একটি গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েছেন অমল হালদার। গুলি লাগে মাথায়। স্কুল মাঠ ও টিউবওয়েল চত্বর রক্তে ভেসে যাওয়ার অবস্থা। দলের জেলা দপ্তরে দুঃসংবাদ যেতেই নেতৃত্বের নির্দেশে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অমল হালদারকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু উপস্থিত সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে চিকিৎসকরা ঘোষণা করেন, দেহে প্রাণ নেই, অমলের মৃত্যু হয়েছে।

ইতিমধ্যে সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ তরুণ নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও নন্দ কুণ্ডু জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে, পরে

সাতের পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ড — বিপর্যয় উত্তর দলিল

(বিপর্যয় পরবর্তী উত্তরাখণ্ডে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পাঠানো চিকিৎসক দলের সদস্য ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন এই লেখায়।)

চার পাশের শান্ত নাগরিক ঘটনা প্রবাহ ও অভ্যস্ত সফল মধ্যবিত্তসুলভ ক্লেশহীন জীবনযাত্রা বিদ্যুৎ চাবুকের মতো কড়কায় যখন আকস্মিক বিপর্যয়ের অভিঘাতে, তখন আমার কিংবা আমাদের অস্তিত্ব, মনন, বৃহতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতার বোধ— সবকিছু ভীষণভাবে নাড়া খেয়ে নতুন করে জীবনের অর্থ খুঁজে নেয়—কোনও কিশোর ছেলের কঠিন চোয়ালের দৃঢ়তায়, কোনও সব হারানো মায়ের নিঃসঙ্গ দৃষ্টিপাতে, কোনও স্বামীহারা বধূর মলিনতায়। আর সেখান থেকেই আরও একটা যাত্রার শুরু বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাতদীর্ণ মানুষের সাথে। যে মহামিছিলের বাইরে যারা তখনও পড়ে আছে— বাস্তবের প্রেক্ষাপটে ভীষণ বিবর্ণ মনে হয়।

বিপর্যয়ের কারণ ও তার ফলাফল— কোনওটাই একমাত্রিক বলে মনে হয়নি আমার কখনও। তাই উত্তরাখণ্ডের মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের কারণে যে অসংখ্য জীবনের পরিসমাপ্তি সেটা একটা সরল সমীকরণে দেখতে দেখতে আসল সত্যিটা ধারণার অগোচরে থেকে যায়। একজন ডাক্তার বা সমাজকর্মী হিসাবে যখন সেখানে গেলাম, তাদের সাথে কিছুকাল কাটালাম, তাদের ঘর-গেরস্থালির একজন হয়ে উঠেছিলাম তখন আরও অনেক সত্যের মত এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল— এই মৃত্যুমিছিলেরও একটি পরিকল্পিত কারণ আছে, এই দুর্দশার পিছনেও চিরকালীন সরকারি ঔদাসীন্য, মিথ্যাচার, অপপ্রচার।

শুরু থেকেই বলা যাক। ২৫ জুন আলোচনায় ঠিক হয় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের তরফে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে — পৃঃ ৪

উত্তরাখণ্ডে মেডিকেল ক্যাম্প

উত্তরাখণ্ডে এস ইউ সি আই (সি)-র ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মেডিকেল ক্যাম্প

৫ আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ • বিকাল ৪টা

বক্তা ঃ

কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ

কমরেড সৌমেন বসু

SUCI(C)

কত হাজার মরলে পরে ...

এক্সে পাতার পর

কলকাতা থেকে প্রথম রিলিফ দলে আমরা ক'জন ডাঃ অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশে রওনা দেব। সেইমতো ২৬ তারিখ ট্রেনে ওঠা। ট্রেনে কয়েকটি বিশেষ বিষয় আলোচিত হয়— প্রথমত প্রতিবারের মত এবারও আমাদের ভরসা বা সম্বল বলতে স্থানীয় মানুষের সাহায্য, সাহচর্য— তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যের অধিকারবোধ জাগানো, তাদের পরামর্শমতো কর্মসূচি রূপায়ণ (যেটা পরবর্তীকালে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করেছিল)। দ্বিতীয়ত চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তাঁদের আস্থা-বিশ্বাস বা চিন্তা-মননশীলতার জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যেহেতু এবারের এই দুর্যোগ ছিল তীর্থস্থানের মধ্যে অন্যতম দুটি বা তিনটি কেন্দ্রিক। তাই প্রচারমাধ্যমে ভীষণভাবে তীর্থযাত্রীদের দিকটি উঠে আসছিল — ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তখনও আলোচনা বৃত্তের বাইরে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ঠিক হয় এঁদের জন্য যাওয়া।

নিউ দিল্লি থেকে সঙ্গ দিলেন উত্তরাখণ্ডের স্থানীয় দুই মানুষ — ভাস্করানন্দ মুণ্ডেপী ও মুকেশ সেমওয়াল। তাঁদের মুখেই শুনলাম গাড়োয়ালিদের অতিথি পরায়ণতার সুখ্যাতি। গ্রামবাসীদের যৌথভাবে কাজ করার প্রবণতা ইত্যাদি। প্রতিটি গ্রামেই বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও অতিথি সেবার কারণে বাসনপত্র, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা যে কোনও সময়ই মজুত থাকে। বাস্তবিকই মোবাইল ক্যাম্প করতে গিয়ে আমাদের কখনওই চিন্তায় পড়তে হয়নি — গ্রামবাসীরাই আমাদের ভার নিয়েছিলেন।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে ২৯ জুন শহরের বিকাশ ভবনের পাশে একটি জায়গায় প্রথম বেস ক্যাম্প শুরু হল। বিভিন্ন আঘাত, সাধারণ ঠাণ্ডা-সর্দি-জ্বর এসবের পাশাপাশি কিছু ক্রনিক সমস্যাও পাচ্ছিলাম। প্রথমদিকে সাধারণভাবে শহরের বাসিন্দারা এলেও শেষ বেলায় দূর পাহাড়ের গ্রাম থেকে এক বৃদ্ধা এসেছিলেন। তাতে আমাদের মনে হল বেস ক্যাম্পের পাশাপাশি দূরে দূরে যেসব গ্রাম ধস, বন্যার কারণে সড়ক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন সেখানে মোবাইল ক্যাম্প করা দরকার। বেছে নেওয়া হল সিলি, ধারসোলা, চামোলা এই রকম আরও কিছু গ্রাম। মানুষজন সেখানে এমনিতেই সব সুবিধা থেকে চিরকালীন বঞ্চিত, এ অবস্থায় তো আরও অসহায়।

গাড়োয়ালের অপার সৌন্দর্য এ পথের আরেক প্রাপ্তি। ২ জুলাই অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প তৈরির উদ্দেশ্যে কেদারনাথের রাস্তায় বাঁশওয়াড়া নামক একটি জায়গায় পৌঁছতে পারা গেল। সেখানে প্রধান ব্রিজ সংলগ্ন সড়কটি ভেঙে পড়েছে। তার পাশের রাস্তাটির অবস্থাও বেশ খারাপ। মন্দাকিনী তার আগের পথ থেকে প্রায় ১০০ মিটার সরে এসেছে। ফলত নদীর তীরে যেখানে আগে প্রায় ৩৫-৪০ জন মানুষের খেত ছিল সেখানে আজ বোল্ডারের স্তূপ। এমনই একজন চাষি শূন্য চোখে নদীর উন্মত্ত প্রবাহ দেখছিলেন, জানেন না অদূর ভবিষ্যতে বা এর পরেও তাঁর জীবিকারকী হবে। ব্রিজ ভেঙেপড়ায় অন্য দিকের বেশ কিছু গ্রাম বিচ্ছিন্ন, সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা ধাপে ধাপে নেওয়া হবে ঠিক হল। বাঁশওয়াড়ায় প্রথম দিনের ক্যাম্পেই সেখানকার স্থানীয় যুবক-যুবতীদের মধ্যে থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। তারা নিজেরাই গ্রামের অনেককে খবর দিয়ে এল, অনুবাদকের কাজ করল, (অনেকক্ষেত্রেই পাহাড়ি মানুষদের কথ্য ভাষা গাড়োয়ালি থেকে হিন্দি অনেকাংশে আলাদা, তাই মাঝেমধ্যে বয়স্কদের ক্ষেত্রে ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল), রোগীদের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ বুঝিয়ে দিল। আমাদের একজন সিস্টার তো বেশ কয়েকজন প্রায়-অনুগামী তৈরি করে ফেললেন।

বাঁশওয়াড়া থেকেই খবর পাচ্ছিলাম, সামনের পথ ক্রমশ খারাপ। উখীমঠের প্রায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার আগেই গ্রামের ও রাস্তার চারপাশে মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে, সেগুলি দাহ করার কেউ নেই। ফলে পচনের পূতিগন্ধে নারকীয় পরিস্থিতি। জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। তাই গ্রামবাসীরা সে সব গ্রাম ছেড়ে নেমে এসেছেন নিচের জনপদগুলিতে। আমাদেরও ধারণা হল এ সব গ্রামে জীবন্ত মানুষ কেউই প্রায় নেই। সেসব জায়গায় কাজ করা যেমন অসম্ভব তেমনই অনাবশ্যক।

আমাদের টিমের কথা এই পরিসরে বলে নিই। কলকাতা থেকে রওনা দিই আমি — ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য, ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডাঃ শামস মুসাফির, ডাঃ প্রশান্ত রায় (সাইকোলজিস্ট) ও ডাঃ স্বপন বিশ্বাস। অমৃতসর থেকে দু'জন তরুণ ডাক্তার — বিবেক সিরোহিয়া ও নীতীশ কুমার যোগ দিলেন। গোয়ালিয়র থেকে তিন সিস্টার মঞ্জেস, নিধি ও সীমা এবং গুজরাট থেকে সব্যসাচী (বিডিএস ইন্টার্ন), আনন্দ (ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত) ও তপন দাশগুপ্ত যোগদান করেন। ফোটোগ্রাফার হিসেবে গুজরাত থেকেই জয়েশজি। বিভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম।

প্রধানত যে ধরনের ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তা এই — প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ, অ্যানালজেসিক বা ব্যথা কমানোর ওষুধ, অ্যান্টাসিড, কয়েক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন মেট্রোনিডাজোল, অ্যামোক্সিসিলিন, সিপরোফ্লক্সাসিন, মাল্টি ভিটামিন ও আয়রন ক্যাপসুল, অ্যালবেনডাজোল, স্কিন অয়েন্টমেন্ট ও ছত্রাকনাশক ওষুধ, কাফ-সিরাপ ইত্যাদি। স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের সি এম ও তাঁদের সংগ্রহ থেকে জীবাণুনাশক হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিলেন। পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় যেগুলো তখন একান্ত দরকার। অনেকের আঘাতজনিত ক্ষত ড্রেসিং করার ছোটখাট ব্যবস্থাও আমরা তৈরি করে ফেলেছিলাম। একজন বৃদ্ধা এসেছিলেন আঘাতজনিত যন্ত্রণা নিয়ে, পরে তাঁর মানসিক যন্ত্রণাও জানলাম — পরিবারের অনেকে নিখোঁজ, অথচ তিনি জীবিত রয়ে গেলেন। তাঁর দু'চোখে জীবনের প্রতি ঘেন্না দেখলাম।

কাজ করতে গিয়ে অনেক কথাই জানা হল। জানা হল নদীর নাব্যতা কমিয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ (বাঁধ তৈরির সময় সমস্ত অব্যবহৃত মাটি ও জঞ্জাল নদীতে ফেলা হয়) পরিবেশবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নদীপাড়ের গাছপালা কেটে ঘরবাড়ি, হোটেল, লজ নির্মাণ — ফল, ভূমিক্ষয় ও ধস, পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট করা ইত্যাদি। সবই জানা বিষয় — 'আনসার ইজ ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড'। কবীর সুমনের অনুবাদটা মনে পড়ল " কত হাজার মরলে পরে বলবে তুমি শেষে, বড্ড বেশি মানুষ গেল বানের জলে ভেসে।"

বিজ্ঞপ্তি

গণদাবী পত্রিকার ১৯৪৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সংখ্যাগুলির ডিজিটাল কপি যারা ডিভিডিতে নিয়েছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে, সমস্ত সংখ্যার সূচিপত্র তৈরি হয়েছে। যারা ডিভিডি নিয়েছেন তাঁরা বিনামূল্যেই এটি পাবেন। ক্রেতারা তাঁদের ই-মেল আই ডি জানালে, আমরা ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দেব। গণদাবী মেলে আপনার ই-মেল আইডি পাঠিয়ে দিন।

ম্যানেজার গণদাবী, ganadabi@gmail.com

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

৩০ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড সেখ আব্দুল খালেক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি শ্বাসকষ্টজনিত অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

মরদেহ জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির অফিসে আনা হলে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষালের পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত। শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, লোকাল সম্পাদক কমরেড মির্জা নাসিরুদ্দিন সহ জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশনাল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফিসে মরদেহ আনা হলে শোকার্ত বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানান। এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি কমরেড আব্দুস সঈদ ও জেলা সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বিয়া মাল্যদান করেন। জেলা মোটর শ্রমিক সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দও শ্রদ্ধা জানান।

পেশায় বিড়ি শ্রমিক কমরেড সেখ আব্দুল খালেক বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আদর্শে আকৃষ্ট হন। বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কাজ থেকে বিড়ি মালিক তাঁকে ছাঁটাই করে। পরবর্তীকালে মোটর শ্রমিক আন্দোলনেরও নেতৃত্বকারী ভূমিকায় তিনি অধিষ্ঠিত হন। আমৃত্যু তিনি যোগ্যতা সহকারে শ্রমিক নেতার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সাথে সাথে দলের সংগঠন গড়ার কাজেও ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা। শারীরিক নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজ করে গেছেন।

অমায়িক ব্যবহারের জন্য নানা স্তরের কমরেডদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক যোগ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রতি, বিশেষত সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনা অধ্যয়নের প্রতি ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা।

তাঁর প্রয়াণে শ্রমজীবী জনগণ ও সাধারণ মানুষ হারালেন শ্রমিক ও গণআন্দোলনের একজন নেতাকে, দল হারাল এক সংগঠককে।

কমরেড সেখ আব্দুল খালেক লাল সেলাম

পার্টি দরদির জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার বালি গ্রামের এসইউসিআই (সি) দলের সুদীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ সাথী কমরেড গোলাম মোস্তাফা ৯ জুন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭৫ সালে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কর্মীদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা দেখে ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে কমরেড মোস্তাফা দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মেধাবী ছাত্র হয়েও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চাকরি করার কথা ভাবেননি। গ্রামীণ পোষ্টমাস্টার হিসাবেই জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, উদারমন, সাধারণ মানুষের মনে কত ছাপ ফেলেছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল, তাঁর শেষযাত্রার মিছিল ও ২৫ জুনের স্মরণসভায় বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় উপস্থিতিতে। বক্তব্য রাখেন শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জী, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড খোদাবক্স সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

কমরেড গোলাম মোস্তাফা লাল সেলাম

জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে বিহারে চিকিৎসকদের আলোচনাসভা

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের (এম এস সি) বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৩ জুলাই পাটনার আই এম এ হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিহার রাজ্য সম্পাদক ডাঃ পি সি সিংহ বলেন, বিহারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং মেডিকেল শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, মেডিকেল এথিকসের অবনমন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর সরকারি আক্রমণ বেড়েই চলেছে। এম এস সি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই সংগঠন তার সূচনাকাল থেকেই ডাঃ নর্মান বেথুন, ডাঃ হ্যানিমান, ডাঃ কোটনিস, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রমুখের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। সাংসদ এবং সংগঠনের সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, জনগণের জন্য চিকিৎসা আমরা সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা হিসাবে চাই না, এটা সরকারের কর্তব্য। সংগঠনের বিহার রাজ্য সভাপতি ডাঃ সত্যজিৎ কুমার সিংহ বলেন, স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ডাঃ পি এন পি পাল বলেন, বিশ্বায়নের সমর্থক সরকার নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এম এস সি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ বি এন পারিয়া সর্বত্র এই সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আবেদন জানান।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র
সুপ্রিম কোর্টের অভিমত প্রসঙ্গে

অবশেষে এক অসাধারণ (!) বোধোদয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার ৬৬ বছরের মাথায় এ দেশের শীর্ষ আদালত উপলব্ধি করেছে যে, এই 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে' নির্বাচনে ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয় এবং উৎকোচও দেওয়া হয়। তাঁদের আরও নাকি ধারণা যে, এ হেন অবস্থায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের দোষ-গুণ বিচার করে সাধারণ মানুষের যথাযথ মতামত দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে তা স্বচ্ছ নির্বাচন সংগঠিত করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে (এই সময় ৬/৭/১৩)।

তামিলনাড়ুর নির্বাচনী লড়াইয়ে ঢালাও উপহার দেওয়ার বিরুদ্ধে এক আইনজীবীর করা মামলার রায় দিতে গিয়ে ৫ জুলাই বিচারপতি পি সদাশিবম ও বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'আইন যাই হোক না কেন, বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। ইস্তাহারে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি অবাধ নির্বাচনের শিকড়ে ধাক্কা দেয়। এরই পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনও জানিয়েছে যে, নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ত করার বাসনায় প্রতিশ্রুতি ও উৎকোচ প্রদানের প্রতিযোগিতা চলছে এবং এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে ছোট দলগুলি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। আর তার পরিণতিতে রাজনৈতিক তথা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। রূঢ় এই সব বাস্তবকে অস্বীকার না করলেও শীর্ষ আদালতের বক্তব্য হল, প্রচলিত আইন অনুসারে নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতিকে ঘুষ দেওয়ার সমরূপ বলা যাবে না। তাই নির্বাচনের পূর্বে যে ইস্তাহার রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ করে তাকে আচরণবিধির আওতার মধ্যে আনবার জন্য শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে নতুন আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে। যদিও আদালত সাথে সাথে বলেছে যে, কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ইস্তাহারে কী বলবে আর কী বলবে না, তা আদালতের বিচার্য বিষয় হতে পারে না। তবে, এ বিষয়েও একটি 'গাইড লাইন' থাকা দরকার বলে আদালত মনে করে।

আদালতের এই নির্দেশ, নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য নিঃসংশয়ে দেখিয়ে দেয় এই দেশে গণতন্ত্রের সমাধি কীভাবে বহু বাগাড়ম্বরের আড়ালে তিল তিল করে রচিত হয়ে চলেছে। যাঁরা এই সব কথা বলছেন ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সৎ — তাঁদের বক্তব্যগুলিও অনেকাংশে সঠিক, তাঁদের কথা অনুযায়ী 'বাস্তব'। তবে দীর্ঘকালের অসংখ্য ঘটনার পর দেশের মহামান্য কর্তাব্যক্তিদের এই বিলম্বিত বোধোদয়ের (!) সংবাদ দেখেশুনে বিস্ময় জাগে বৈ কি !

সত্যিসত্যিই কি এগুলি তাঁদের অজানা ছিল? ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি তো অন্য কথা, নির্বাচনের আগে সাইকেল থেকে ল্যাপটপ, কালার টিভি, মঙ্গল সূত্রের নাম করে সোনা দেওয়া, এমনকী নগদ টাকা দেওয়ার ঘটনায় তো কোনও রাখঢাক নেই। এ কি কেবল সাম্প্রতিক ঘটনা? সাধারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকেই কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সহ সমস্ত ক্ষমতাবান দল নির্বাচনে উৎকোচ দিয়ে নির্বাচকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনি? এ দেশকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে বাগাড়ম্বরের আড়ালে এই ধরনের কলঙ্কজনক ঘটনার স্রোত অব্যাহত থেকেছে। অথচ তার প্রতিকারের কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ কোনও তরফ থেকেই নেওয়া হয়নি। ২০০৬ সালে তামিলনাড়ুতে এক করুণানিধির দল দেড় কোটি ভোটারকে কালার টিভি দিয়েছিল। এ কি দেশের কর্তাব্যক্তিদের গোচরে আসেনি? সরাসরি নগদ টাকা দিয়ে ভোট কেনার ঘটনা যে ইতিপূর্বেই নির্বাচনের সমগ্র প্রক্রিয়াকেই একটি করুণ প্রহসনে পরিণত করেছে তা বোঝা কি খুবই কঠিন ছিল ?

মানুষের মতামতের মূল্য, তার গণতান্ত্রিক অধিকারকে মর্যাদা দেওয়ার সামান্যতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বহুদিন আগে থেকেই দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। এ দেশের কোটি কোটি হত দরিদ্র মানুষের অভাব, দুরবস্থা, অসহায়তা, তার লাচারির সুযোগ নিয়ে, ক্ষমতাসীন সরকারি দলগুলি বা ক্ষমতাবান বিরোধী দলগুলি যে নির্বাচনী আসর মাত করে — এ সত্য তো খোলা বই-এর মতো পরিষ্কার। মানুষের মতামতকে ওরা তোয়াক্কা করে না, মর্যাদা দেয় না। মানুষের মতামতকে এই দলগুলি কেনে। কেনে কাগজের নোট দিয়ে, উৎকোচ দিয়ে। বলে, 'নোট দিয়ে ভোট'। অর্থাৎ ভোটও একটা বাজার, যেখানে লেনদেন চলে। মতামতকে কিনে ক্ষমতায় আসীন হয়ে এই বৃহৎ দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মেই মুনাফা অর্জনের খেলায় মত্ত হয়। ঘটে কোটি কোটি মানুষের শরীর-মন নিংড়ানো রাজস্বের অপচয়, ঘটে আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতি। ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জীবনযাপনের দুর্বিষহ জ্বালায় ন্যুব্জকুব্জ মানুষের কাঁধে ক্রমাগত করের বোঝা চাপিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয় ওই নেতা-মন্ত্রীরা।

পুঁজিপতিরাও বিনিময়ে এই দলগুলির উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করে তাদের নিজস্ব স্বার্থে। তারা 'চাঁদা' দেয়। এ সংবাদও নানা সময়ে বেরিয়েছে কীভাবে শিল্পপতিরা বিভিন্ন দলকে শত শত কোটি টাকা 'চাঁদা' দেয়। এ ডি আর (অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্ম)-এর প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে, কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সহ সরকারি দলগুলি তাদের তহবিলের ৮০ শতাংশ আয়ের উৎস গোপন করেই রেখেছে। ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে কংগ্রেস ২০০৮ কোটি, বিজেপি ৯৯৪ কোটি এবং সিপিএম পেয়েছে ৪১৭ কোটি টাকা (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩-৯-১২)। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে প্রকাশ করা আয়-ব্যয়ের হিসাবেও দেখা যাচ্ছে, তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পায় (এই সময়, ২১-৭-১৩)। বৃহৎ দলগুলির সঙ্গে পুঁজিপতিশ্রেণির এই দেওয়া নেওয়া কি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারীদের অজানা? এ সব স্বীকৃত দলগুলির সাথেই আলাপ আলোচনা করে নির্বাচনী বিধি তৈরি করে কি ভারতবর্ষের আপামর মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে? গণতন্ত্রের মূল্য দেওয়া যাবে? নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার তাগিদে উৎকোচ প্রদানের কুৎসিত প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যাবে কি? তা কোনও মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারি দল বা সরকারে যেতে পারার সম্ভাবনা নিয়ে থাকা দলগুলি এতে সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বলেই চলেছে, এই পথটাই নাকি সঠিক পথ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারে বর্তমানে আসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় থেকে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিম প্রায় সমস্বরে বলে চলেছেন — এ রায় শিরোধার্য। এই রায় নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। কংগ্রেস, বিজেপি সহ বাকিরাও যে একই কথা বলবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শুধু মানুষের মতামতকে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, উৎকোচ বা নগদ টাকায় কিনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শিকড়ে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে তাই তো নয়, মানুষের মতকে সুকৌশলে বৃহৎ ও সরকারি দলগুলির পক্ষে গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে প্রচার মাধ্যমকে — সে সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল যাই হোক না কেন— তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার পথে। প্রচারমাধ্যম বর্তমান যুগে প্রযুক্তির নানান উপকরণে খুবই শক্তিশালী। কিন্তু প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে কারা? শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নয় কি? নিয়ত পরিকল্পিত প্রচারের দ্বারা যে ঝড় এই মাধ্যমগুলি সৃষ্টি করে তার দ্বারা জনমত যথেষ্টই প্রভাবিত হয়। এ সবই করা হয় নিরপেক্ষতার আবরণে।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা চালু করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও শিক্ষা থেকে আমাদের দল এ কথা বারবার তুলে ধরেছে যে, এ দেশের নিপীড়িত জনসাধারণকে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পুঁজিপতিশ্রেণি তাদের 'তাঁতের মাকু'র মতো একবার এ'দল বা জোট, আরেকবার অন্য দল বা অন্য জোটের পিছনে জড়ো করবার কৌশল নিয়েছে। স্বভাবতই পুঁজিপতিদের সেবাদাস দল বা জোটের পক্ষেই জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমকে তারা ব্যবহার করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সেই উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবেই তারা অদ্ভুত এক মেরুকরণ সৃষ্টি করে। এই মেরুকরণ কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন তৈরি করা হয়, তেমনি রাজ্য স্তরেও তা করা হয় পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী আঞ্চলিক দলগুলিকে দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। জরুরি অবস্থার পর এই নির্বাচনে প্রবল ইন্দিরা গান্ধি বিরোধী ক্ষোভকে প্রচার মাধ্যম রাতারাতি তৈরি করা 'জনতা' দলের পক্ষের প্রবল ঝড়ে পরিণত করেছিল। মাত্র ৪৮ ঘন্টায় সে ঝড় গোটা দেশে প্রবলভাবে বইয়ে দিতে পেরেছিল এই প্রচারমাধ্যম। কয়েক বছরের মধ্যেই সেই ঝড় দিক পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালে আবার ইন্দিরা গান্ধিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিল। সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের এই ভূমিকাটিকে অস্বীকার করবার আজ আর কোনও উপায় নেই। সেই থেকে জনমতকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করে হয় কংগ্রেস নয় বিজেপি, হয় কংগ্রেস জোট নয় বিজেপি জোট, রাজ্যে রাজ্যে হয় এ পার্টি নয় সে পার্টি, বর্তমানে এ রাজ্যে হয় সিপিএম না হয় তৃণমূল কংগ্রেস, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুনরায় সিপিএম — এই ধরনের মনোভাব তৈরি করে সাধারণ মানুষের মতামতকে দুটি কি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে একে অপরের বিকল্প হিসাবে প্রচার করে, কৃত্রিম মেরুকরণ সৃষ্টি করানো হচ্ছে মিডিয়ার দ্বারা। প্রতিদিন, বিশেষ করে নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে টিভি চ্যানেলগুলিতে তীব্র বাদানুবাদের ছবি জনসাধারণের সামনে এমন করে উপস্থিত করা হয় যাতে এই মেরুকরণ একটা স্বাভাবিক বিষয় হিসাবেই প্রতিভাত হয়। যে দলই ক্ষমতায় আসুক পুঁজিপতিশ্রেণির তাতে ক্ষতি নেই। সমূহ ক্ষতি তো জনসাধারণের।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এই মেরুকরণ সৃষ্টির দ্বারা প্রবলভাবেই বিঘ্নিত হয়ে চলেছে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে। মানুষের মতামতকে উৎকোচ বা প্রতিশ্রুতির দ্বারা বৃহৎ দল বা সরকারি দল শুধু কেনে না — মতামতকে তারা দেশের শাসকশ্রেণির স্বার্থে তৈরিও করে। এই কি যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া? আদালত বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষ কি এ বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন? সাংবাদিকতার নৈতিকতা, সংবাদমাধ্যমের যথার্থ স্বাধীনতার দাবিও এইভাবে পদদলিত হয়। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, এই দেশে বা রাজ্যে যথার্থ জনস্বার্থে কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদ যে দল করে তার সংবাদ তারা মূলত প্রচার করে না। তাই শীর্ষ আদালত বা কমিশন যে আইনই করুক তার দ্বারা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে যথার্থ গণতান্ত্রিক করা সম্ভব কি? সেখানে শুধু অর্থ বা উৎকোচ বা প্রতিশ্রুতি প্রদানই নয় সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাকেও যদি যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত না করা যায় তাহলে স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়া এবং তাতে জনমতের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব নয়।

সর্বোপরি যে দিকটি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কিনিষ্ট করে দিয়ে 'গণতন্ত্র' কথাটিকেই নিতান্ত প্রহসনে পরিণত করেছে সেদিকে শীর্ষ আদালত বা নির্বাচন কমিশন কারোরই নজর পড়েনি। সেই রূঢ় বাস্তবকে তাঁরা কেন দেখতে পেলেন না তাও বিস্ময়কর। সেই দিকটি হল গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর উদ্ধত পেশিশক্তির আস্ফালন। এটা ঘটে সরকারি প্রশাসন ও রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজশে। গোটা দেশের নির্বাচনে এই মাফিয়া গোষ্ঠীর ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা বা সংযত করার কোনও প্রচেষ্টাই কোনও পক্ষ গ্রহণ করছে না। অন্য রাজ্যের বহু ইতিহাস বাদ দিলেও নির্বাচনে এই পশ্চিম বাংলাতেই পেশিশক্তির আস্ফালন কি কারও অজানা ?

১৯৭২ সালে ব্যালট বাক্স নদীতে, খালে, রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে গোছা গোছা ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্যে তাতে ছাপ মেরে কংগ্রেস দল সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল এই পশ্চিমবাংলায়। কোনও আদালত তাকে সংযত করেনি। সেই মন্ত্রীসভা খ্যাতিলাভ করেছিল 'চোরেদের বিধানসভার মন্ত্রীসভা' নামে। তার আগেও যে এসব ঘটেনি তা নয়, তবে এরপর থেকে নির্বাচনে চৌর্যবৃত্তিই বড় দল বা সংবিধানের ভাষায় স্বীকৃত দলের কর্ম মহিমা। তারপর থেকে থেকে ধীরে ধীরে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট, গোপন ভোটকে বন্দুক দেখিয়ে 'চট তোলা' ভোটে রূপান্তরিত করা, নির্বাচনে বিরোধী পক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না দেওয়াই হয়ে পড়ল যেন স্বাভাবিক ঘটনা। তারই নাম হল 'গণতন্ত্র'। যেমন, সিপিএম-এর শাসনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাজার হাজার প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'বিজয়ী' হতেন। এবার তাঁরা গদিচ্যুত। তাই গদিতে আসীন তৃণমূল কংগ্রেসের হাজার হাজার প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'বিজয়ী'। পিছনে পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ। এর দ্বারা গণতন্ত্রকে যেভাবে হত্যা করা হয় তার বিহিত করা কি অনেক বেশি জরুরি নয়? আর নির্বাচনে কারচুপিকে সিপিএম তার সাড়ে তিন দশকের শাসনে পশ্চিম বাংলায় যে নিপুণ 'শিল্প কলার' স্তরে উন্নীত করেছে অন্যান্য তাবৎ বৃহৎ দলগুলি সে ক্ষেত্রে যথার্থই শিশু ! শুধু নির্বাচনের দিন নয়, ভোটার লিস্ট তৈরি থেকে শুরু করে গণনার কৌশল সব কিছুতেই সিপিএম তার কর্মী বাহিনী এবং ভোট কর্মীদের যেভাবে 'শিক্ষিত' করে তুলেছে, তা নিঃসন্দেহে একটি উন্নত গবেষণার বিষয়। পুলিশ সহ সমস্ত প্রশাসনকে যেভাবে তারা এই ঘৃণ্য কাজে ব্যবহার করেছে, তার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়া দরকার। বর্তমানে সরকারি গদি হারিয়ে এই ক্ষমতা প্রয়োগ না করতে পারায় তারা বেশ কিছুটা হতোদ্যম। ফলে নির্বাচনে সত্যিকারের স্বচ্ছতা, যথার্থ জনমতের প্রতিফলন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া — এ সবই অতীতের বিষয় হয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক তা আজ বিলুপ্ত প্রায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম যুগে, পুঁজিবাদের অবাধ

সাতের পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক

যৌনতা, ভালবাসা, পারিবারিক জীবন ও দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রে একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কী হওয়া উচিত— এ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনা থেকে অংশবিশেষ নিয়ে 'কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক' পুস্তিকাটি সংকলিত হয়েছে। সংকলনটি এ বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক চিন্তার একটা রূপরেখা মাত্র — সমগ্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সংকলনটির প্রথম অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। বাকি অংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'— এ কথাটা বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা বলেছিলেন। কিন্তু, এই বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কিছুদূর এগিয়ে ঐতিহাসিক কারণেই শোষণ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাধ্য হলেন এবং তার ফলে মানবতাবাদ আর বেশি দূর এগোতে পারল না। সাম্যবাদ এই মানবতাবাদ বা বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেয়ে মহৎ ও উন্নততর আদর্শ।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা

বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা এক সময়ে সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু, তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত অহম (যেটা যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মিথ্যা মর্যাদাবোধ) ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ— এগুলোকে বিসর্জন দিতে পারেননি। এগুলো মিশেছিল তাঁদের সমাজবোধের, সামাজিক কল্যাণবোধের ও আদর্শবাদের সঙ্গে যেমন করে সোনার সঙ্গে খাদ মিশে থাকে। সামাজিক কর্তব্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থবোধের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁরা চলবার চেষ্টা করেছিলেন— করে ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী যতটা এগোবার তাঁরা এগিয়েছেন। কিন্তু, ঐ ফাঁকিটুকুর জন্যই মানবতাবাদের অনেক ঘোষিত উচ্চ নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আজকের যুগে সকল মানবতাবাদীরাই মুখ থুবড়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতে পর্যবসিত হয়েছেন। আজ আর জনগণের দুঃখ-দুর্দশায়, তাদের আন্দোলনে, বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন না।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের শেষ, সাম্যবাদের শুরু

মানবতাবাদী নীতি-নৈতিকতা ও ভগ্নাবশেষের ওপরেই সাম্যবাদী নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ও বিকাশলাভ করে। বুর্জোয়া মানবতাবাদের যেখানে শেষ, সাম্যবাদের সেখানে শুরু।

সাম্যবাদী হতে হলে ব্যক্তিস্বার্থবোধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। যে হাসিমুখে, নির্দ্বিধায়, স্বেচ্ছায় এবং নিঃশর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে, একমাত্র সেই যথার্থ কমিউনিস্ট হতে পারে। সেই যথার্থ সাম্যবাদী হতে পারে— যার মানবতাবোধ ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, একে অপরের সঙ্গে খাদ হয়ে মিশে নেই, যে নির্দ্বিধায় ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে শিখেছে এবং তা পারে হাসিমুখে। সবাই তা পারে না। যে পারে সেই কমিউনিস্ট হবার যোগ্য। সেই কমিউনিস্ট হবার সম্মান অর্জন করে। সেই যথার্থ ও খাঁটি কমিউনিস্ট হতে পারে। যারা ব্যক্তিস্বার্থবোধ পরিত্যাগ করতে পারেনি, সমাজপ্রগতিতে নির্দ্বিধায় ও নিঃশর্তে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না, তাদের কমিউনিস্ট নাম নেওয়া হল মিথ্যা অহঙ্কার। সত্যিকারের কমিউনিস্ট তারা নয়। তারা বড়জোর 'assumed' — অর্থাৎ, ধরে নেওয়া কমিউনিস্ট। বড়জোর কমিউনিজমের চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু চরিত্র কমিউনিস্টের মতো নয়। ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্রে, আচারে, রুচিতে, নীতি-নৈতিকতায় ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট তারা নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, আচারে, রুচিতে ও নীতি-নৈতিকতায় তারা তখনই কমিউনিস্ট, যখন তাদের এই সমস্ত কিছুই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অহমবোধ থেকে মুক্ত। তখন তারা পুরোপুরি ক্লাস ওয়ান— অর্থাৎ, প্রথম সারির কমিউনিস্ট। তা হলে প্রথম সারির কমিউনিস্ট হতে হলে মানবতাবাদীদের সমস্ত গুণাবলী ও মূল্যবোধকে নিঃশেষ করে দিতে হবে ও মানবতাবাদীরা যেটা পারেনি, যেখানে অকৃতকার্য হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে বা পিছিয়ে পড়েছে— সেই সীমাটা পার করে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে। ...

সর্বাগ্রে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী করার প্রয়াস না করে অপরকে কী করে বিপ্লবী হবার কথা বলা যায়

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। এইসব assumed কমিউনিস্ট নেতা— পরিবারের মানুষকে তারা বিপ্লবী করতে পারবেন কিনা সেটা অন্য কথা— কিন্তু, তাঁরা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের বিপ্লবী হওয়ার কথা বলার আগে অপরের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী হতে বলেন কী করে? না-খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়েদের এঁরা ডাক দিচ্ছেন তাদের মা-বাবার কথাও না ভেবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। অথচ, নিজেদের স্ত্রী-পরিবারের কথা এঁরা না ভেবে পারেন না। নিজের ছেলেমেয়েকে 'কনভেন্টে' বা পাবলিক স্কুলে পড়াবার কথা না ভেবে পারেন না। নিজের ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার করার কথা না ভেবে পারেন না। তা হলে পরিবারের মানুষগুলোকে বিপ্লবী করার প্রচেষ্টার ফল কী দাঁড়াবে? এ সংগ্রামটাও তো কোনও দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। না হলে, বিপ্লবের সংগ্রাম কি কেবল মাঠে-ময়দানে লোক খেপাবার জন্য? যদি তাঁরা যথার্থ মার্কসবাদী হন, যথার্থ বিপ্লবী হন, তা হলে এ সংগ্রাম তাঁরা পরিহার করে চলেছেন কেন?

কারণ, আমরা সাফল্যলাভ করি বা না করি, নিজেদের আত্মীয়-পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী আদর্শ ও চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস আমাদের করতেই হয়। এর ফলে হয়তো পরিবারের লোকগুলি তাদের নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো ভালো বিপ্লবী কর্মী হবে। কিন্তু, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, তারা সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী তো দূরের কথা, একজন সাধারণ কর্মী বলতে আমরা যা বুঝি তাও হয়ে উঠল না, তখন পাছে কমরেডদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে তার জন্য হয়তো কেউ তার স্ত্রীকে একটা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি খাড়া করে সেখানে তার একটা সদস্য করে রাখেন, যেন তিনি ঐ ফ্রন্টে কাজ করছেন।

হয় বিপ্লবী তাঁর পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবেন, আর নয়তো তাদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটবে — এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনও রাস্তা নেই

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা কী বলে? একজন মার্কসবাদী, স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ককে কী দৃষ্টিতে দেখবে? এটা কি সত্য নয় যে, পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনকী তাদের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করবে?

সুতরাং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হল, বিপ্লবী নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গদানের ক্ষেত্রে বিপ্লবীর লক্ষ্য কী হবে? হয় বিপ্লবী তাকে সব সময় বিপ্লবী করার চেষ্টা করে এবং তার ফলে অবিপ্লবী চরিত্রটির উপর বিপ্লবী সংস্কৃতি ও ভাবনা-ধারণার প্রভাব বর্তায় এবং সে উদ্বুদ্ধ হয়। যদি বর্তায়, তাহলে সে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে আসে। আর যদি না বর্তায়, তাহলে তার সঙ্গে বিপ্লবীর সম্পর্ক— সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, সেরকম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। তাদের মধ্যে কোনও রকম ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, অবিপ্লবীর সঙ্গে যদি ভালোবাসার সম্পর্ক চলতে থাকে, তা হলে অবিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

কথাটা একটু বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন বিপ্লবী, কিন্তু অপরজন বিপ্লবী নন। এ অবস্থায় তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার আদানপ্রদান যদি চলতে থাকে, তা হলে ফলটা কী দাঁড়াবে? বিপ্লবী যদি তাকে বিপ্লবী করতে না পেরে থাকে, তাহলে বিপ্লবী আজ হোক বা কাল হোক অধঃপতিত হতে বাধ্য। কারণ, কেউ কাউকে প্রভাবিত করছে না— দু'জন দু'জায়গায় বসে ভালবাসার আদানপ্রদান করছে— কোনও সংস্কৃতি কোনও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে না— এ তো মার্কসবাদ নয়, কোনও বিজ্ঞানই নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনও শাস্ত্রেই এটা পড়ে না। এর একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে নেতা তার যৌন সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি অমার্কসবাদী হওয়ার জন্য বাইরের মাঠে-ময়দানে 'বিপ্লবী', অথচ ব্যক্তিগত, রুচিগত, যৌনগত, ভালোবাসা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নে তিনি পেটিবুর্জোয়া, বুর্জোয়া, অথবা একজন নোংরা চরিত্রের ব্যক্তি— এটাই। যে বিপ্লবী পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী করতে পারল না, তার তো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার কথা। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন ...।

এই সমস্ত নেতারা, পার্টি ও বিপ্লব থেকে আলাদা একটা ব্যক্তিগত জীবন বজায় রেখে চলেন। এখানেই আপত্তি। এই কারণে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, এত দুর্বল। কেউ কি দেখাতে পারবেন যে, বিশ্বের কোনও বড় কমিউনিস্ট নেতা— যিনি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন (those who dared to lead revolution)— তাঁর পরিবারকে প্রভাবিত করতে পারেননি, অথচ পরিবারের সঙ্গে জীবন যাপন করেছেন? না। হয় তাঁরা তাঁদের পরিবারকে প্রভাবিত করেছেন, নাহয় তাঁদের পরিবারের সাথে বেদনাময় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছে। তাঁদের কাছে এছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। হয় তাঁরা পরিবারকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের বিপ্লবের অনুগামী করে তুলেছেন— তা সে যে স্তরেই হোক না কেন— আর নয় তো পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সহাবস্থানের কোনও উদ্ভট তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করেননি।

শুধুই বুদ্ধি দিয়ে মার্কসবাদ বুঝলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা রস ও আবেগের স্তরে পৌঁছয়, ততক্ষণ তা চরিত্রকে প্রভাবিত করে না

সকল মার্কসবাদী, সকল জ্ঞানী-গুণী তাত্ত্বিকই এ কথাটা ভালো করে জানেন যে, হৃদয়বৃত্তির আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা মানুষের সংস্কৃতি ও চরিত্রের উপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। যদি কেউ শুধুই বুদ্ধির সাহায্যে বিপ্লবী তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং রস ও আবেগের স্তরে তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হন, তা হলে সে তত্ত্ব তাঁর চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না— তা তিনি যতই বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন না কেন। এগুলো তখন বুদ্ধির উপরের স্তরে সাজানো থাকে মাত্র, লেখার জন্য, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বা আলাপ-আলোচনা করার জন্য— কিন্তু চরিত্রকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে কোনও কাজে আসে না।

যে কেউ বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে পারে, কিন্তু তা তখনই তাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তার জীবনকে পাল্টে দিতে পারে, যখন সে তত্ত্ব রস ও আবেগের আকারে তার ভেতরে প্রবেশ করে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মান-অভিমান— এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুন্দর ও উন্নত হৃদয়বৃত্তি। এ যেমন মানুষকে বড় করে, মহৎ করতে সাহায্য করে, আবার এ মানুষকে নিম্নগামী করে, অধঃপতিত করার রাস্তায় নিয়ে যায়।

হয় বিপ্লবী তাঁর চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের উন্নত ও অনুপ্রাণিত করবেন, নয়তো তিনি নিজে অধঃপতিত হতে বাধ্য

বিপ্লবীর সঙ্গে (অপর কারুর) বন্ধুত্ব, বা হৃদয়াকো, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার বা যৌন সম্পর্কের আদানপ্রদানের অর্থ হল, বিপ্লবী সংস্কৃতির ভাবনা-ধারণা, রুচি-রসবোধ এগুলো আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে অপরের মধ্যে গিয়ে বর্তাবে তার বুদ্ধিকে টপকে। এর জন্য তো বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। মেলামেশা, আদানপ্রদান, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে, রসের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে, হয় বিপ্লবীর রসানুভূতি, ভাবনা-ধারণা, সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করবে, আর তা না হলে, বুঝে হোক বা

ছয়ের পাতায় দেখুন

আবারও সাধারণ ধর্মঘট গ্রিসে

১৬ জুলাই দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটে আবারও স্তব্ধ হল গ্রিস। সে দেশের সরকার নতুন করে আবার যে ব্যয়সংকোচের খাঁড়া দেশের মানুষের উপর নামিয়ে আনতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল দেশের দুটি প্রধান শ্রমিক সংগঠন।

এই বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হলেন গ্রিসের খেটে খাওয়া মানুষ। গ্রিসের অর্থনীতি বিধ্বস্ত। দেশটা ঋণের ভারে জর্জরিত। এই ঋণের অধিকাংশ জোগাচ্ছে তিন সাম্রাজ্যবাদী ঋণদাতা সংস্থা — ইউরোপিয়ান কমিশন, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা আই এম এফ। ঋণ তারা দেবে একটি শর্তে — গ্রিস সরকারকে জনকল্যাণ সহ সরকারি নানা খাতে ব্যাপক ব্যয়ছাঁটাই করে দেনা শোধ করার টাকা জোগাড় করতে হবে। মাথা পেতে সেই শর্ত মেনে নিয়েছে গ্রিস সরকার। ইতিমধ্যেই সরকারি ব্যয়সংকোচের দৌলতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অথবা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা খাতের বহু খরচ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি হয়ে পড়েছে ব্যয়বহুল। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে। এবার নতুন ঋণ পেতে ঐ তিন সংস্থার শর্ত অনুযায়ী গ্রিস সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বছরের মধ্যে ৪ হাজার সরকারি কর্মীকে ছাঁটাই করার। এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষক, প্রচারমাধ্যমের কর্মী, সরকারি দপ্তরের কেয়ারটেকার, পৌর পুলিশ কর্মী ইত্যাদি। ২০১৪ সাল শেষ হতে হতে আরও ১৫ হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করার এবং ২৫ হাজার কর্মীকে হয় বসিয়ে দেওয়া, নয়ত অন্য দপ্তরে বাধ্যতামূলক ভাবে বদলি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে গ্রিস সরকার।

এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন গোটা গ্রিসের সাধারণ মানুষ। এমনিতেই, গোটা দেশ জুড়ে অসংখ্য বেকার, জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। আরও ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৬ জুলাই পথে নেমে গোটা দেশ অচল করে দিয়েছেন প্রায় ১৬ হাজার মানুষ। সেদিন বন্ধ ছিল সমস্ত সরকারি দপ্তর। হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র জরুরি বিভাগ চালু ছিল। ট্রেন, বাস সহ পরিবহণ ব্যবস্থা থমকে গিয়েছিল। এমনকী বাতিল হয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক উড়ানগুলিও। শ্রমিক-কর্মচারীরা সরকারবিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করেছেন রাস্তায় রাস্তায়। স্লোগান দিয়েছেন — 'ঋণদাতা ত্রয়ী নিপাত যাক', 'সরকারি খরচ নয়, খোদ সরকারটাকেই ছাঁটাই করো' ইত্যাদি।

গোটা বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতো বেকার সমস্যায় জর্জরিত গ্রিসেও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে ঠেকেছে। কারণ, তাদের হাতে কাজ নেই, তাই জিনিসপত্র কেনার মতো যথেষ্ট অর্থও নেই। নতুন করে ব্যয়সংকোচের খাঁড়া চালিয়ে সরকার যদি আরও হাজার হাজার মানুষের হাত থেকে কাজ কেড়ে নেয়, তা হলে উৎপাদিত পণ্য কেনার মতো লোক খুঁজে পাওয়াই যে দুষ্কর হবে, তা বলাই বাহুল্য। সরকারের নীতিনির্ধারকরাও সে কথা জানেন। কিন্তু শোষণমূলক, ব্যাক্তিমালিকানার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিরসনীয় এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোলা নেই তাঁদের সামনে। যতদিন না ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটছে ততদিন সংকটের গভীরতর গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলাই এই ব্যবস্থার ভবিতব্য।

জয়নগরে আন্ত্রিকে আক্রান্তদের পাশে বিধায়ক তরুণ নস্কর

জয়নগর-২ ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের জন্য একমাত্র সম্বল দু'টি নলকূপ। এক বছর ধরে সেগুলির যথাযথ সংস্কারের অভাবে পরিশ্রুত জল পাচ্ছেন না মানুষ। ফলে আন্ত্রিকের শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। গত বছর একই ঘটনা ঘটায় এসইউসিআই(সি) দলের কর্মীরা সেখানে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর সেই সময়ই প্রশাসনের কাছে নলকূপ দু'টি সংস্কারের দাবি জানান। কিন্তু তা উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

এবারও গ্রামবাসীদের আন্ত্রিকে আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে বিধায়ক তরুণ নস্কর ১৭ জুলাই হাসপাতালে অসুস্থদের দেখতে যান। ১৮ জুলাই তিনি এলাকা পরিদর্শন করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের অজুহাতে সরকারি তরফে অসুস্থদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বিধায়কের তৎপরতায় ব্লক মেডিকেল অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং ডাক্তার নার্স পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। ডি এম নলকূপকে দূষণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। হাসপাতালে বিধায়কের সাথে উপস্থিত ছিলেন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী।

১৩ জুলাই এ আই ডি এস ও বাঙ্গালোর জেলা ৭ম ছাত্র সম্মেলন

গুজরাটে এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও-র ডাকে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট

১০০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গুজরাটের ভদোদরার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ জুলাই এ আই ডি এস ও-র ডাকে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য উপাচার্য ২০০ পুলিশ, ৯ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৩ জন ইন্সপেক্টরকে মোতায়েন করেন। বিজেপির ছাত্র শাখা এবিভিপি এবং কংগ্রেসের এন এস ইউ (আই) ক্লাসে ক্লাসে, হোস্টেলের ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। শিক্ষকদের একাংশ ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দিয়ে বলেন, ধর্মঘটের দিন ক্লাসে না এলে ইন্টারনাল মার্কিং এবং গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হবে। এসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট সফল করেছেন। কলা, বাণিজ্য এবং এডুকেশন ফ্যাকালটিতে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের কিছু ছাত্রকে দালাল ইউনিয়নগুলির ছাত্রনেতারা জোর করে ক্লাসে পাঠানোর চেষ্টা করে।

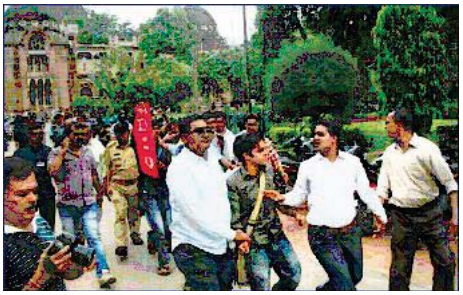

পিকেটিংরত ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

পিকেটিংরত এ আই ডি এস ও-র ৮ জন নেতা ও কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিল কর্তৃপক্ষের শিক্ষাবিরোধী কোনও পদক্ষেপই ছাত্রসমাজ নীরবে মেনে নেবে না এবং সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন এবং আস্থা কত প্রবল ও আন্তরিক।

রাঁচিতে ছাত্র বিক্ষোভ

ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার একটি হোস্টেল থেকে চার ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে এ আই ডি এস ও রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৭ জুলাই এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আলবার্ট এক্কা চকে সমবেত হয়ে রাঁচি শহর পরিক্রমা করে।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করে এবং রাজ্যের সমস্ত ছাত্রী হোস্টেলে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাঁচি জেলা সম্পাদক কমরেড বহ্নিশিখা সমাজপতি। সভাশেষে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা জ্বালানো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ

বর্ষার পূর্বেই পাঁশকুড়ার রাধাবনে ভেঙে যাওয়া বাক্সী নদীর বাঁধ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্মাণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তিল-বাদাম-সবজি-ফুল-পাট-মাছ চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পুকুরের জলে দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ৭ জুন এস ইউ সি আই (সি)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসককে স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সন্তোষ মাইতি, জেলার সংগঠক কমরেডস নারায়ণচন্দ্র নায়ক, প্রণব মাইতি, স্থানীয় কর্মী সমরেশ মাইতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১ জুন হড়পা বানে বাক্সী নদীর বাঁধ ভেঙে পাঁশকুড়া-১ ব্লকের চৈতন্যপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাবন, দুমদান, গুড়িয়া, দক্ষিণ নেকড়া, ভগৎপুর সহ ৭টি গ্রাম বেশ কয়েকদিন বন্যার জলে ডুবে থাকায় এলাকার তিল-বাদাম-সবজি-পাট-ফুল-মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ১৫/২০টি পরিবার আজও রাস্তায় অস্থায়ী ছাউনিতে দিনযাপন করছেন। পুকুরগুলিতে বন্যার জল ঢুকে যাওয়ায় দূষিত হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যে কোনও সময় আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পরে ঐ প্রতিনিধিদল নদী বাঁধ বর্ষার পূর্বেই বাঁধার দাবিতে সেচদপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের সাথে দেখা করে আলোচনা করেন।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের ডেপুটেশন

৭ জুন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর সাথে মহাকরণে দেখা করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদক নেপাল বাগ। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারিতে নূনতম মজুরি দৈনিক ২২৮ টাকা ঘোষণা করলেও আজও তা চালুর ব্যাপারে দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে হোসিয়ারি শিল্পের মেকার মালিকদের সংগঠন এবং সিটু ও এআইটিইউসি অনুমোদিত দুটি পেটোয়া শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। মন্ত্রী ঐ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কোনও ভাবেই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হবে না বলে জানিয়ে প্রতিনিধি দলকে বলেন, খুব শীঘ্রই সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও মালিক সংগনঠকে নিয়ে নূনতম মজুরির বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলোর রোশনাইয়ে ঢাকা নিকষ অন্ধকার

লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন পাঁচ বছর আগে। তিন ছেলেমেয়ে তাঁর। পানশালায় নাচ-গান করেই তিনি প্রতিপালন করেন তাদের। শরীর অবসন্ন হলেও রেহাই নেই— নাচতে তাঁকে হবেই। সন্তানদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে এ ছাড়া তাঁর যেমন কোনও উপায় নেই, তেমনই পানশালার মালিকরাও রেহাই দেবে না তাঁকে। 'ড্যান্স বার' — সমাজের উচ্চবিত্ত নানা উপায়ে বিপুল অর্থ রোজগার করা মানুষের ভোগবিলাসের ও তাদের মন জুগিয়ে নর্তকীদের জীবিকা অর্জনের জায়গা। মুম্বইয়ের ৭৫ হাজার নর্তকীর জীবন ইতিহাস লক্ষ্মীবাইয়ের মতোই।

আর পাঁচটা মানুষের মতো এই নর্তকীদের অনেকেই বাবা-মা-ভাই-বোনের সংসারে বড় হয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন সুস্থ জীবন-যাপনের। কিন্তু পেট বড় বালাই। গরিব পরিবারে শুধু বেঁচে থাকার অন্য কোনও উপায় না থাকায় বাধ্য হন এঁরা এই পেশায় আসতে। অনেকে অন্য রাজ্য থেকে পাচারকারীদের মারফত পাচার হয়ে পৌঁছন এই অন্ধকার গন্তব্যে। নাচ করে রোজগার করতে ঢুকলেও এঁরা সম্ভ্রম হারাতে চাননি। কিন্তু এর পিছনে যে বিরাট চক্র কাজ করে, যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি খাটে, তাতে সম্ভ্রম শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয় না। মান-সম্ভ্রম ধূলোয় লুটিয়ে পেশাদারি নাচিয়ে বানিয়ে মুনাফার পণ্য করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। বহু হাত বদল হয়ে একটি সাধারণ পরিবারের মেয়েই হয়ে ওঠে অন্ধকার জগতের বাদশাদের হাতের পুতুল। চোখের জলের সাক্ষী থাকে না কেউ। দালালদের মোটা টাকার লেনদেনে, কোনও রাঘববোয়ালের চোখে পড়লে রাতারাতি বিদেশে বিক্রিও হয়ে যান। পরিবার-পরিজন, আত্মসম্ভ্রম, মান-সম্মানের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এদের এক একজনকে হতে হয় পেশাদার, দক্ষ নাচিয়ে। কলের পুতুলের মতো জীবন। কোটি কোটি টাকার মালিক বাবুদের কেনা গোলাম। নৃত্যের তালে তালে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, খোলা দেহ প্রদর্শন, কাস্টমারদের মনোরঞ্জন করতে হয়। দেহব্যবসাতে এদের পুরোপুরি তৈরি করে দেওয়া হয়। দালাল ও পানশালা মালিকের রক্তচক্ষুর সামনে কারও কারও সামান্যতম প্রতিবাদও মুহূর্তে নস্যাৎ হয়ে যায়। রুজি হারাতে হবে যে। তাহলে তো চোখের সামনে শুধু অনাহার আর ক্ষুধার ছবি! শিউরে উঠে এগিয়ে যেতে হয় কাস্টমারদের সেবায়। শরীর, মন না চাইলেও রোজগার যে করতেই হবে! যৌন অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে অন্ধকারময় প্রতিটি মুহূর্ত কাটে এদের। শরীর-মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হয়। সমাজে চরম অবহেলিত, অসম্মানিত হওয়ায় কারও এতটুকু সহানুভূতিও জোটে না। চতুর্দিকের কোলাহলমুখর জীবনে চাপা পড়ে যায় এঁদের বোবা কান্না। আলোর রোশনাইয়ের আড়ালে চাপা পড়ে যায় কত শত লক্ষ্মীবাঈ, তারা বাঈ-রা। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা সর্বত্র।

ড্যান্স বার বা পানশালা থাকা উচিত কি উচিত নয় এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও মহারাষ্ট্র সরকারের চাপান-উতোরের পর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, পানশালাগুলি বন্ধ করা যাবে না। মহারাষ্ট্রের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। কিছু সংবাদমাধ্যম জোর তর্ক জুড়ে দিয়েছে, তিন তারা না কি পাঁচ তারা কোন হোটেলে ড্যান্স বার চললে 'পাবলিকের সাবালকত্ব' কিছুটা হলেও রক্ষা পেতে পারে! পানশালাগুলি বাস্তবে অসামাজিক কাজকর্মের গুহা এবং পতিতাবৃত্তির আঁতুড়ঘর— এ কথা সত্য। রাজ্য তথা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে এগুলি, এই অভিযোগও অসত্য নয়। মহারাষ্ট্র সরকার রায়ের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, যে শাসক দলগুলি আজ এর বিরুদ্ধে বলছে, তারা অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে বা যুব সমাজের নৈতিক মান যাতে ধসে না যায় তার জন্য কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? কোনও উদ্যোগই তারা নেয়নি, উপরন্তু এ সমস্ত দলের প্রশ্রয়েই পানশালায় নৃত্যব্যবসা, নর্তকীদের দিয়ে বিত্তশালী লোকেদের মনোরঞ্জন করা, এমনকী দেহব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে পানশালাগুলিকে অনুমোদন দিয়ে মোটা টাকা মালিকের থেকে আদায় করা — এ সমস্তই তারা দীর্ঘদিন করে এসেছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলা অর্থের বিনিময়ে কদর্য ভোগলালসা মেটানোর ব্যবসা আরও দৃঢ়মূলই হবে। সুপ্রিম কোর্ট নাকি 'নর্তকীদের কথা ভেবে' এই রায় দিয়েছে। কিন্তু আদালত হোক বা সরকার উভয়েই নর্তকীদের জীবনকে আরও অন্ধকারের পথেই ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। মহারাষ্ট্র সরকার আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে ২০০৫ সাল থেকে রাজ্যে ড্যান্স বার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করেনি এই পেশার মানুষদের জন্য, তাঁদের পরিবারের জন্য। বহু জন সেই সময় সংসার চালানোর কোনও উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকে আবার দেশ-বিদেশের নানা যৌনপল্লিতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সরকার কি তাদের অসহায়তা এতটুকুও উপলব্ধি করতে পেরেছে? পারলে হাজার হাজার মানুষ যে পেশায় যুক্ত তাকে শুধুমাত্র নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত থাকত না, তাদের বেঁচে থাকার বিকল্প ব্যবস্থা করত। সরকারেরই উচিত বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এঁদের সসম্মানে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করা— যাতে আরও অন্ধকারময় জীবনের পথে এঁদের ছুটতে না হয়। আদালতেরও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা ও মহারাষ্ট্র সরকারের কাজের উপর তদারকি করা উচিত। তাহলেই একমাত্র অমানুষের জীবন থেকে এঁরা রক্ষা পেতে পারেন।

মুম্বই ড্যান্সবার ঃ সরকার কোনও দায়িত্বই পালন করেনি

মহারাষ্ট্রের বন্ধ ড্যান্সবারগুলি খোলার পক্ষে যে রায় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে, এস ইউ সি আই (সি) মুম্বই শহর সাংগঠনিক কমিটি এক বিবৃতিতে তা পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নর্তকীদের জীবনজীবিকার প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিতে পারত না যদি মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বই পুলিশ আইনে সংশোধন এনে শুধু এই সব পানশালা ও হোটেলগুলিতে নাচ নিষিদ্ধ করে দায়িত্ব শেষ না করত, এঁদের সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করত। সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পুলিশ আইনে নতুন সংশোধনী বা রিভিউ পিটিশন দাখিলই যথেষ্ট নয়, সরকারকে এঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে মহিলাদের একদল পুরুষের সামনে নাচতে বাধ্য করা সামন্তী সংস্কৃতি, যা নারীদের পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের দাস হিসাবে গণ্য করে তার আত্মসম্মান ও মর্যাদার হানি ঘটায়। একেই এখন বিনোদনের নামে, আধুনিক রূপে পরিবেশন করা হচ্ছে। বিনোদনের নামে এই সব পানশালায় এমনকী দেহব্যবসা পর্যন্ত চলে। জীবিকার সম্মানজনক পথ না পেয়ে বেকার যুবতীরা এবং ১৯৯২-'৯৩ সালে মুম্বই দাঙ্গায় সব-হারানো দুর্দশাগ্রস্ত নারীরা বেঁচে থাকার জন্য দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে ভবিষ্যৎ পরিণাম না ভেবেই এই পেশায় যেতে বাধ্য হয়।

দলের মুম্বই কমিটির পক্ষ থেকে ড্যান্সবারগুলি পুনরায় খোলার পক্ষে কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতারণামূলক কোনও যুক্তিতে বিভ্রান্ত না হয়ে এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানানো হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

চারের পাতার পর

না বুঝে হোক— বুদ্ধি দিয়ে কেউ স্বীকার করুন বা না করুন— তাঁর অজ্ঞাতসারেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, মানসিকতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ধারণা, রসবোধ, যেগুলো অপরের মধ্যে রয়েছে, যার সঙ্গে বিপ্লবীর এই কারবার— তা সে তার স্ত্রী, বোন, বা পুত্র-কন্যা যেই হোক না কেন— সেগুলো তার অজ্ঞাতসারে তার চরিত্রের উপর, তার স্বভাবের উপর, তার রসবোধ ও নীতি-নৈতিকতার ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

অর্থাৎ, হয় বিপ্লবী তাদের প্রভাবিত করবেন, আর নয়তো তারা বিপ্লবীকে প্রভাবিত ও অধঃপতিত করবে। কেউ কাউকে প্রভাবিত করবে না— সেটা কখনও হয় না। এটা অবশ্যই হতে পারে যে, একটা সংগ্রাম থেকে দু'জনে দু'দিকে ছিটকে গেলেন। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনও মানসিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু, মানসিক সম্পর্ক আছে, আবেগ আছে, মান-অভিমানও আছে, ঝগড়াও আছে, মিলও আছে, অথচ কেউ কাউকে প্রভাবিত করছে না — এটা কী? এটা কি বিজ্ঞান?

আবার, বিপ্লবী যদি অপরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম না হন, অপরে নিশ্চয় তাঁকে প্রভাবিত করবে। মোটা অর্থে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, এই প্রভাব এমনকী বুদ্ধি বৃত্তির উপরও বর্তায়। অনেক সময় আমরা বুঝতে সক্ষম হই না, কী কারণে প্রখর বোধশক্তি, জ্ঞান ও মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা যথেষ্ট ক্ষুরধারসম্পন্ন হয় না। বস্তুত, এটাই তার কারণ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন মানুষ যার ত্যাগের সীমা-পরিসীমা নেই, যার মধ্যে ঐকান্তিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবোধ ও বিপ্লবের প্রতি একনিষ্ঠতার অভাব নেই— এমন একজন মানুষ, সচেতন মানসিক ক্রিয়ার দিক থেকে যার মধ্যে এর কোনটারই অভাব নেই— যে কঠিন পরিশ্রমী, যার মধ্যে বোধশক্তির একটা গড়পড়তা মান রয়েছে— এমন একটা স্তরে রয়েছে, যে স্তর থেকে বুদ্ধি বৃত্তির যে কোনও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু, এত কিছুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও ক্ষুরধার বোধশক্তির অভাব ঘটে।

অর্থাৎ কিনা, যত সূক্ষ্মই হোক, একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। এমনকী যদি নিজেকে অধঃপতনের হাত থেকে মুখ্যত রক্ষা করতেও পেরে থাকি, রুখতে পারব না আমার চিন্তার বিকৃতি, ধরতে পারব না কোথায় এবং কেন বুদ্ধির জট সৃষ্টি হচ্ছে আমার মধ্যে, এবং কী কারণে আমার বোধশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতার উত্তরোত্তর বিকাশের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং বিপরীতে আমার রাজনৈতিক কর্মক্ষমতাও— যদিও আমি সবসময় রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি— আমার হাত থেকে কিছুটা কেড়ে নিচ্ছে। এবং পরিণামে একদিন এ চরম অনিষ্ট ঘটাতে পারে। কারণ, 'চিরকাল আমি জনসাধারণের মধ্যে থেকেছি, বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে রয়েছি এবং চিরকালই আমি একজন লড়াকু, সুতরাং আমার অধঃপতন ঘটতে পারে না, বিচ্যুতি ঘটতে পারে না'— এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, একেবারেই ঠিক নয়।

আবার, এরকম স্তরের কোনও মানুষের বিচ্যুতি ঘটলে, একটা সোজা যুক্তি অনেক মার্কসবাদী দিয়ে থাকেন— কোনও মানুষই অভ্রান্ত নয়। যেহেতু, যে কোনও মানুষেরই বিচ্যুতি ঘটতে পারে, সেই কারণেই লিউ শাও চি-রও বিচ্যুতি ঘটে গেল— এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু, জীবনভর বিপ্লবের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পতন কেন ঘটে— ভেবেছেন কি? বহুদিন বিপ্লবী ছিলেন ট্রটস্কি, বিপ্লবী ছিলেন বুখারিন ও লিউ শাও চি। এ কথা কেউ বলতে পারবেন না যে, বিপ্লবকে এঁরা চিরকাল ফাঁকি দিয়ে গেছেন। এঁরা লড়েছেন, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে গড়ে উঠেছেন, সব সময় দল ও সংগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, সামনে থেকে সংগ্রামে হাতে-কলমে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তবুও তাঁদের এই পতন হল কেন? এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা নাকি? অথবা, অদৃশ্য কোনও বিষয়ের জন্য এই পতন ঘটল? এ ধরনের চিন্তা তো পুরোপুরি অতীন্দ্রিয়বাদ। ব্যাপার হল যখন মানুষ ঐসব সূক্ষ্ম, খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, ক্ষতি ধীরে ধীরে সঞ্চি ত হতে থাকে এবং পরিণামে দেখা যায় যে, একদিনের বিপ্লবী আরেকদিনের অধঃপতিত শোধনবাদী। একদিনের বস্তুবাদী সংগ্রামী মার্কসিস্ট, আরেকদিনের সাঁইবাবার চেলা। ...

আমরা যখন অপরের এ ধরনের অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করি, তখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বা দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করি। এবং এ ধরনের অধঃপতনকে আমরা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখি না। অধিকন্তু যে বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করি, তা হল, দল এ ধরনের ঘটনাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করছে কি না, বা একে রুখবার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম গড়ে তুলছে কি না। কারণ, (আমাদের) অধঃপতন ঘটাবার জন্য যে শক্তি সমাজ পরিবেশে কাজ করছে— যে শক্তি প্রতিমুহূর্তে দলের কর্মী ও নেতাদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছে, তা বড়ই প্রবল এবং বারবার আঘাত হানছে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

গুলি চালিয়ে হত্যা করা হল নিরপরাধ যুবককে

একের পাতার পর

হাসপাতালে যান। হত্যাস্থলে উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের কাছে কঠোর ভাষায় জানতে চাওয়া হয় বিনা প্ররোচনায় এ ভাবে গুলি চালিয়ে শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করা হল কেন? কেন একজন নিরাপরাধ যুবকের প্রাণ নেওয়া হল? কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও তাদের ডেকে আনল কে? কেন ডাকা হল? কে তাদের এই বিশেষ বুথটি চেনাল? গুলি চালাবার নির্দেশ দিল কে? কেনই বা মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল?

এই সব প্রশ্ন রাজ্য কমিটির তরফে লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো অভিযোগে বলা হয়েছে দ্রুত ভোটের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে ঐ বুথে পোলিং স্টাফের সংখ্যা বাড়ানো হল না কেন? দলের পক্ষ থেকে সেক্টর ও রিটার্নিং অফিসারের কাছে বারবার ভোটগ্রহণ দ্রুত করার জন্য দাবি জানানোর পর দুপুরে ভোট দেওয়ার টেবিল একটি বাড়ানো সম্ভব হলেও, অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কেন নেওয়া হয়নি? ভোট দিতে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলে ভোটারদের অসন্তোষ প্রকাশ কি গণতন্ত্রে অপরাধ? এ সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি।

নেতারা এরপর ঘোষালের চকে কমরেড অমলের বাড়িতে যান। অমলের বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের বুকফাটা আর্তনাদের মাঝে গ্রামের শত শত মানুষের মুখে ঐ প্রশ্নগুলিই ফিরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছিল। ২০ জুলাই অমলের মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে এলে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী, বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর সহ কমরেড নন্দ কুণ্ডু, কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, কমরেড রূপম চৌধুরী, কমরেড প্রবীর বৈদ্য, কমরেড খালেক মোল্লা প্রমুখ মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, অন্যান্য দলের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

২১ জুলাই রাজ্য কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় দেড়শতাধিক স্থানে শোক বেদিতে মাল্যদান, কালো ব্যাজ ধারণ, সকাল দশটায় নীরবতা পালন করা হয়। জেলা কমিটি স্থির করেছে ২৬ জুলাই রক্তাক্ত সেই স্কুল ময়দানে জনসমাবেশ করে অমলকে স্মরণ করা হবে।

রাজ্য জুড়ে শোক প্রকাশ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত কমরেড অমল হালদারের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২১ জুলাই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে প্রতিটি জেলায় অসংখ্য গ্রাম-গঞ্জ-শহর, রেলস্টেশন, বাজার সহ জনবহুল স্থানে শোকবেদি স্থাপন করে মাল্যদান করা হয়। এই মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার হন অসংখ্য মানুষ।

কেতুগ্রামে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর তৃণমূলের লাগামছাড়া সন্ত্রাস

তৃণমূলের লাগামছাড়া সন্ত্রাসে বর্ধমানের কেতুগ্রাম-১ নং ব্লকের গ্রামসভাগুলিতে এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক দল প্রার্থী দিতে পারেনি। ৪টি গ্রামসভায় এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তৃণমূল লাগাতার সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়েকজন নির্দল প্রার্থী নামমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসের ভয়ে ভোটের দিন তাঁরা বেরোতেই পারেননি। পাণ্ডুগ্রাম অঞ্চলের দুটি গ্রামসভায় ১৫ জুন নির্বাচনের দিন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের বুথ থেকে মেরে বের করে দেয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। দলের বুথক্যাম্পে হামলা চালায়, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিতে শুরু করে। বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের কোজলসা গ্রামে ২টি গ্রামসভায় বাইক বাহিনী ঢুকিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করলেও স্থানীয় গরিব মানুষ ও এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের প্রতিরোধে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কেতুগ্রাম ব্লক-১ এর জেলাপরিষদ প্রার্থী কমরেড মফিজুল আলমকে মারধর করে মোবাইল ও চশমা ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয় সংগঠক কচি মুন্সিকে বুথের ভিতরে মারধর করে। গ্রামসভার প্রার্থী ও এজেন্টদের মারধর করে। এস ইউ সি আই (সি) জিততে পারে এই আশঙ্কায় তারা একের পর এক আক্রমণ চালায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মী-সমর্থক ও গ্রামবাসীদের উপর। মহিলাদের অশালীন উক্তি করে, সম্ভ্রমহানির ভয় দেখায়।

১৭ জুলাই কোজলসা বাজারে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা গেলে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয়। পরদিন বাজারে পুনরায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর আক্রমণ শুরু করে ২২-২৩ জন দুষ্কৃতী। কর্মীরা গ্রামে ঢুকতে গেলে তারা বোমা মারতে শুরু করে। হইচই শুনে তোয়েবা বিবি নামে এক বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলে বোমার আঘাতে তিনি গুরুতর আহত পান। গ্রামবাসীদের পাল্টা প্রতিরোধ করার সময়ও পুলিশের কোনও সাহায্য পাননি। ঐ দিন রাতেই পুলিশের চোখের সামনে দুষ্কৃতীরা দলীয় সমর্থকদের ঘর ভেঙে দেয়। নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৩০ জন গ্রামছাড়া হন। পরদিন দুষ্কৃতীদের বাধায় তোয়েবা বিবিকে চিকিৎসার জন্য কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি। জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। থানার অফিসার উভয়পক্ষকে নিয়ে শান্তি বৈঠকের কথা বললেও বাস্তবে কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যও অব্যাহত।

লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে প্রয়াত নেত্রী প্রতিভা মুখার্জীর স্মরণে সভা

১৫ জুন কলকাতায় স্টুডেন্টস হলে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী প্রয়াত প্রতিভা মুখার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী মলয় সেনগুপ্ত। সভায় শোকবার্তা পাঠান প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী অনিল কুমার সেন। কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখার্জী, খ্যাতনামা আইনজীবী বিশ্বনাথ বাজপেয়ী ও পৃথ্বীশ বাগচি। বিচারপতি শ্রী সেন শোকবার্তায় লেখেন 'আমি একজন ব্যতিক্রমী চরিত্রের বন্ধুকে হারালাম'। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক শ্রী ভবেশ গাঙ্গুলী ছাড়াও সংগঠনের সহসভাপতি সদানন্দ বাগল, কমল লাহিড়ী ও রামচন্দ্র ব্যানার্জী এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী হাসি হোড় বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলেই প্রতিভা মুখার্জীর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ও বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র

তিনের পাতার পর

বিকাশের যুগে যে গণতন্ত্র ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, তা আজকের একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে প্রহসন রূপেই বিদ্যমান।

তাই কেবল উৎকোচ প্রদান, ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে নির্দেশিকা জারি করে গণতন্ত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। শীর্ষ আদালত এবং নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের এই উপলব্ধি যদি ঘটে থাকে তবেই তা বাস্তব চিত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে। কারণ নির্বাচন এখন নিয়ন্ত্রিত হয় 'মানি-মিডিয়া-মাফিয়া'— এই তিন চক্রের পারস্পরিক যোগসাজশে। নতুন নির্দেশিকা জারির পূর্বে এই চক্রকে ভাঙার নির্দেশিকা দিতে তাঁরা পারবেন কি? মূল সমাধান তো সেখানেই নিহিত।

আমরা পরিশেষে জনসাধারণকে ভেবে দেখতে বলব, এই পুঁজিবাদী সমাজ নতুন করে আর আমাদের সুন্দর কিছু দিতে পারবে কি না। গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ সমাজ জীবন থেকে নিঃশেষিত প্রায়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করছে দেশের শুভবুদ্ধিকে। সরকারের মন্ত্রীরা চরম আর্থিক কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত। প্রশাসনের সর্বস্তরে তার ছাপ। সম্প্রতি দেখা গেল, যারা কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্তে নিযুক্ত সেই সিবিআই অফিসারই ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ছে। বিচার ব্যবস্থাও এই পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কীভাবে উৎকোচের সাথে যুক্ত, একজন প্রখ্যাত আইনজীবী শান্তিভূষণ প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর সব ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্যঃ গণদাবী, ৭-১০ জানুয়ারি, ২০১১)।

বাস্তবিক পক্ষে এই পুঁজিবাদী সমাজই সমস্ত অত্যাচার শোষণ দুর্নীতি অরাজকতার উৎসভূমি। মালিকশ্রেণির এই রাজত্বের অবসান না ঘটলে সত্যিকারের দুর্নীতির অবসান সম্ভব নয়। মালিকশ্রেণি চায় এই পচা গলা সমাজকে টিকিয়ে রাখতে তার নিজস্ব মুনাফার স্বার্থে। তাই সেই সব রাজনৈতিক দলকে তারা রাখতে চায় সরকারি ক্ষমতায়, যারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। চেষ্টা করে যাতে এই সমাজকে পরিবর্তন করার পক্ষে জনমত কোনওভাবেই তৈরি না হয় এবং যদি জনমত তৈরিও হয় তাকে যেভাবেই হোক দমন করতে চায় শাসক শ্রেণি। তাই 'মানি-মিডিয়া-মাফিয়া'র সাহায্যে নির্বাচন এ সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কোনও আইন দিয়ে বা কোনও নির্দেশিকা জারি করে কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব? চিন্তা করতে হবে সামগ্রিকভাবে। সামগ্রিকভাবে এই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করার দায়িত্ববোধই এক নতুন মূল্যবোধকে আনবে। তবেই যথার্থ গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা-সংস্কৃতি পরিস্ফুট হবে।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে

এ আই ডি এস ও-র আসাম রাজ্য ছাত্র সম্মেলন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ধ্বংসকারী নীতি প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়ে ৮-৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র আসাম রাজ্য সম্মেলন। ৮ জুলাই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গুয়াহাটির লক্ষীধর বরা ময়দানে। ১৬টি জেলা থেকে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম। মুখ্য বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের পলিটব্যুরো সদস্য, জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শিক্ষা আন্দোলন আজ প্রায় শ্রেণি সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। শিক্ষার সমস্যাকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই শিক্ষা সংকোচনের পথে হাঁটছে। শাসক শ্রেণি প্রকৃত শিক্ষার প্রসার কখনও চায়নি। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থেই হচ্ছে। শিক্ষা বাচাঁনোর আন্দোলনে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী চিন্তা-ভাবনার উর্ধ্বে উঠে ছাত্রদের শিক্ষা রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড জিতেন্দ্র চলিহা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী। সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী।

৯ জুলাই গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। ৫০৪ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী। তিনি শিক্ষার উপর সরকারি আক্রমণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, সারা দেশে ডি এস ও-ই একমাত্র শক্তি যারা প্রতিদিন লড়াই গড়ে তুলছে এবং কিছু কিছু প্রতিরোধ করাও সম্ভব হচ্ছে। প্রতিনিধিরা সমগ্র দিন প্রাণবন্ত পরিবেশে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। কমরেড জিতেন্দ্র চলিহাকে সভাপতি ও কমরেড প্রজ্বল দেবকে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে ৩১ জনের রাজ্য কমিটি এবং ৭৯ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়। সমাবেশে নব নির্বাচিত রাজ্য কমিটি আন্দোলনের একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

নির্বাচনের পরেও সন্ত্রাস অব্যাহত

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হলেও বন্ধ হয়নি সন্ত্রাস, হুমকি ও নৃশংস হামলাবাজি। নমিনেশন পর্ব থেকেই জেলার কাঁথি ও এগরা মহকুমার পটাশপুর, ভগবানপুর, খেজুরি এবং নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই (সি)-র প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি, জোর করে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানো, মিথ্যা অজুহাতে দলের কর্মীদের তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর, পরীক্ষার্থী ছেলের হাত মারাত্মকভাবে জখম করে। এরপর মারতে মারতে তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

ঘটনার অনেক পরে পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে। প্রশাসন নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ায় ওঁরা পরদিন ১৬ জুলাই পটাশপুরের বাড়িতে যান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রশাসন তাঁদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থাই করেনি। ঐদিন সকালে পুনরায় তাঁরা আক্রান্ত

তমলুক হাসপাতালে কমরেড নমিতা দাসকে দেখতে গিয়েছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রচারে বাধা দেওয়া, বিরোধী ভোটারদের হুমকি ও ভোটদানে বাধা সৃষ্টি ব্যাপকভাবে করে চলেছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরও চলছে আক্রমণ।

দলের জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি জানান, পটাশপুর থানার অন্তর্গত ব্রজলালপুর অঞ্চলের পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-এর জেলা পরিষদ (৩৭ নং) প্রার্থী কমরেড নমিতা দাস এবং পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী তাঁর স্বামী কমরেড বলাই দাস তৃণমূল কংগ্রেসের বাধা ও হুমকি সত্ত্বেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় প্রথম থেকেই তাঁদের উপর আক্রমণ, প্রচারে বাধা দেওয়া, বাড়ি লাঠি-সোটা, বোমা নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। প্রশাসনকে তা বারবার জানানো সত্ত্বেও তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। হুমকি দিয়ে তৃণমূল কর্মীরা এজেন্ট দিতে দেয়নি, বিরোধী ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দিয়েছে। ১৫ জুলাই ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর পুলিশ চলে গেলেই তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০/৫০ জন লাঠিধারী বাহিনী এঁদের বাড়ি আক্রমণ করে। ভাঙচুর, লুঠপাট করে স্বামী-সন্তান সহ নমিতা দাসের উপর বর্বর হামলা চালায় ও অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়, তাঁর হন। তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আইসিডিএস সহায়িকা নমিতা দাসকে সেন্টারেই নৃশংসভাবে আক্রমণ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষদের সামনে তাঁকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। এখানেই থেমে থাকেনি দুষ্কৃতীরা। উপর্যুপরি বর্বর আক্রমণে বিপর্যস্ত নমিতা দাস, তাঁর স্বামী ও সন্তানের নামে মিথ্যা সাজানো অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস করা হয়েছে। পটাশপুর থানার ভূমিকাও নিরপেক্ষ নয়। পুলিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা করে কমরেড দিলীপ মাইতি বলেন, যে মহিলা প্রার্থী উপর্যুপরি ভয়াবহ আক্রমণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাঁর বিরুদ্ধেই পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। শাসক দলের নির্দেশে প্রশাসনের এই ভূমিকা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তিনি বলেন, সন্ত্রাসে তৃণমূল সিপিএমের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে।

অপরাধীদের গ্রেপ্তার, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, মিথ্যা কেস প্রত্যাহারের দাবি সহ নারীনিগ্রহের প্রতিবাদে ১৭ই জুলাই এগরা থানায় এবং তমলুক ডি এম-এর কাছে এস ইউ সি আই (সি)-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নমিতা দাসের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ১৭ জুলাই তমলুকে জেলাশাসকের দপ্তরে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন।

কুডানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করার নিন্দায় পিপলস কমিটি ফর সেফ এনার্জি

'পিকোস' বা পিপলস কমিটি ফর সেফ এনার্জি-র পক্ষ থেকে ১৬ জুলাই নিম্নের বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

"জনগণের লাগাতার প্রতিবাদ ও তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সরকার যেভাবে কুডানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং ইউনিট চালু করার কাজ শুরু করল, 'পিকোস' তার তীব্র নিন্দা করছে। কুডানকুলাম প্ল্যান্টের নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু বিশেষজ্ঞই অনেক গুরুতর আপত্তি তুলেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, প্ল্যান্ট চালু করার আগে তার নিরাপত্তা, পরিবেশের উপর প্রভাব, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও সমগ্র ব্যবস্থাটির গুণমান সহ প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা করে দেখবে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বডি (এ ই আর বি), নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (এন পি সি আই এল), মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্টাল ফরেস্ট এবং তামিলনাড়ু পাওয়ার কন্ট্রোল বোর্ড। কিন্তু তা না করে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা না করে সরকার প্ল্যান্ট চালু করে দিল। এ ই আর বি একটা ফিকির বার করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে এড়িয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আক্ষরিক অর্থ দাঁড় করিয়ে তারা বন্ধ খামে একটি রিপোর্ট ১২ জুলাই বিকালে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছে এবং আদালত বা অন্য কেউ সেই রিপোর্ট খুলে পড়বার বা সেই মতো কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগে এন পি সি আই এল প্ল্যান্ট চালু করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। 'পিকোস' দাবি করেছিল যে, বিশেষজ্ঞদের একটি স্বাধীন কমিটি বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে দেখার আগে যেন প্ল্যান্ট চালু না করা হয়। যেভাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্বেগকে কোনও আমল না দিয়ে এন পি সি আই এল দ্বিচারিতা করেছে, তার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে 'পিকোস'। সাথে সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ওখানকার সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছে 'পিকোস'।"

পাট্টার দাবিতে কেওনঝরে কৃষক বিক্ষোভ

ভূমিহীন কৃষকদের পাট্টার দাবিতে ওড়িশার কেওনঝরে হরিচন্দনপুর তহশিলে ১৫ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ।

মিড ডে মিল খেয়ে শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে ধিক্কার বিহারের সর্বত্র

বিহারের সারন জেলার ধর্মসতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল খেয়ে ২৭ জন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র বিহার রাজ্য কমিটি ১৭ জুলাই রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। মিড ডে মিল নিয়ে সরকারের নিদারুণ অবহেলা ঢাকতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে তড়িঘড়ি চক্রান্তের তত্ত্ব খাড়া করতে চেয়েছেন, তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সদর হাসপাতালে ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকলে এতগুলি শিশুর প্রাণ যেত না বলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মৃত শিশুদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত আক্রান্ত শিশুর সরকারি খরচে উন্নত মানের চিকিৎসার দাবিতে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল হয়। পাটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করা হয়। সারন, মুঙ্গের, মুজফ্ফরপুর, দ্বারভাঙা, জেহানাবাদ, কুরথা, আরোয়াল জেলা সহ আরও বহু স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in